ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 584-591
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.046

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্পে ভাতের অভাব একটি বিশ্লেষণী পাঠ

রাজু লায়েক, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উইমেন্স কলেজ, তিনসুকিয়া, আসাম, ভারত*

Received: 19.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mahasweta Devi's work is not only a treasure trove of Bengali literature, but has also earned her the status of one of the greatest Indian authors. She was involved in various movements and initiatives during the second half of the 20th century. Based on this experience, she undertook numerous projects aimed at supporting the lower classes and tribal communities across several states in India, including West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, and Chhattisgarh. She connected with their lives, feeling their happiness, sorrow, hopes, aspirations, livelihoods, exploitation, and deprivation. This empathy is also reflected in her literary work and the characters she created. Therefore, it is said that Mahasweta's pen acted as their representative.

In her various novels and stories, such as "Bhat," "Sanjh-Sakaler Maa," and "Jatudhan," the issue of food shortages, along with other pressing problems, is particularly evident. The analysis of these three stories illustrates how people's mindsets have changed regarding the scarcity of food and highlights the helplessness experienced by individuals facing these shortages.

Key Words: Rice, Livelihood, Common man, Scarcity, Food.

পৃথিবীর সব সাহিত্যে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি একান্তভাবেই লক্ষণীয়। প্রায় সব ভাষার সাহিত্যে সমাজ ও বাস্তবতা মুখ্য বিষয়। নিম্নবর্গের সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষ ও জনজাতিকে কেন্দ্র করে যারা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর জন্ম ১৪ই জানুয়ারি ১৯২৬ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায়। পিতা সাহিত্যিক মনীষ ঘটক। মাতার নাম ধরিত্রী দেবী। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘ঝাঁসীর রাণী’ ও প্রথম উপন্যাস ‘নটী’। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। কথাসাহিত্য থেকে আরম্ভ করে অনুবাদ ও জীবনীসহ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তিনি অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাকর্মগুলি হল— ‘হাজার চুরাশির মা’, ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু’, ‘অগ্নিগর্ভ’, ‘স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প’, ও ‘চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর’ ইত্যাদি। আদিবাসী মানুষদের নিয়ে কাজ করার জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি ‘পদ্মশ্রী’ পুরস্কার লাভ করেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর

রচিত গল্পে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে অন্যতম বিষয় হল খাদ্যের অভাব। তাঁর রচিত তিনটি গল্প 'ভাত', 'সাঁঝ-সকালের মা' ও 'জাতুধান' নির্বাচিত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অন্ন বা ভাতের অভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজ, মানুষের মন, জীবন-জীবিকা, অভাব-অনটন, মানুষের সরলতা, শোষণের চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন দিক গল্পগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে। খাদ্য ও অভাবের তাড়না মানুষকে কীভাবে বিচলিত করেছে তা তৎকালীন সময়ের বাস্তবতাকেই ব্যক্ত করে। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য রচনার উৎস সম্পর্কে জানা যায়—

> "I have always believed that the real history is made by ordinary people. I constantly come across the reappearance, in various forms, of folklore, ballads, myths and legends, carried by ordinary people across generations. … The reason and the inspiration for my writing are those people who are exploited and used, and yet do not accept defeat. For me, the endless source of ingredients for writing is in these amazingly noble, suffering human beings. Why should I look for my raw materials elsewhere, once I have started knowing them? Sometimes it seems to me that my writing is really their doing."[১]

১

সাধারণ মানুষের বাস্তব সত্যকে মহাশ্বেতা দেবীর বহু গল্পে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এইরকমই একটি বাস্তব সত্য হল খাদ্যের অভাব বা ভাতের অভাবের চিত্র। তাঁর যে গল্পগুলিতে ভাতের অভাব চোখে পড়ে তার মধ্যে 'ভাত', 'সাঁঝ-সকালের মা' ও 'জাতুধান' এই তিনটি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত গল্পগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে কীভাবে গল্পের চরিত্রগুলিকে ভাতের অভাব প্রভাবিত করেছে।

'ভাত': 'ভাত' গল্পের নায়ক বা প্রধান চরিত্র উৎসব নাইয়া, গল্পে যাকে 'উচ্ছব' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সে আবাদ অঞ্চলের মানুষ। উচ্ছবের সংসারে রয়েছে স্ত্রী, ছেলে ও এক মেয়ে। সতীশ মিস্তিরির জমিতে উচ্ছব কাজ করে বছরের কয়েকটি মাস কোনোভাবে কষ্টের মধ্যদিয়ে জীবন-যাপন করে। গল্পে দেখা যায়, তার মনিবের ধানের ফলন এবার আশানুরূপ হয়নি, কারণ 'ধানে মড়ক' লেগেছে। যার ফলে দুশ্চিন্তায় উচ্ছবের কান্নায় চোখে জল আসে। তারপর ধান ক্ষেতে লাগে আগুন। উচ্ছবের বাড়ি মাতলা নদীর তীরে। সন্ধ্যের পর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মাতলা নদী উত্তাল হয়ে ওঠে। এইসব দুশ্চিন্তার মধ্যে সেই দিন সন্ধ্যের সময় উচ্ছব পেট ভরে খেয়েছিল হিঞ্চে আর গুগলি সেদ্ধ নুন লঙ্কা পোড়া দিয়ে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘরবাড়ি সমেত পুরো পরিবারকে হারিয়ে উচ্ছবের জীবন ছন্নছাড়া হয়ে উঠেছে। একটি গাছকে আঁকড়ে ধরে নিজের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পর পর কয়েকদিন পরিবারের সন্ধান করে তার পেটে কিছুই পড়েনি। এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর উচ্ছবের মনিব তাকে নানা অজুহাত দেখিয়ে ভাত দিতে অস্বীকার করে।

গল্পের আরেক চরিত্র বাসিনী, উচ্ছব নাইয়ার গ্রামের মেয়ে। দুর্যোগের পর বাসিনীর বোন ও ভাজ কলকাতা যাচ্ছিল। আর এই গ্রামের সকলেই অবগত বাসিনী কলকাতায় যে বাড়িতে কাজ করে, সেখানে ভাতের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উচ্ছবের সংসারে আজ আর কেউ জীবিত নেই, সে এখন দিশেহারা। তাই উচ্ছবের মনে হঠাৎ করে চিন্তা আসে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে খেয়ে মেখে আসবে।

অপর দিকে বাসিনীর কাজের বাড়িতে কর্তা বিরাশি বছর বয়সে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত। কর্তার সুস্থ কামনা করে হোম-যজ্ঞ-এর সাথে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে বাসিনীর সূত্রে উচ্ছবের কাজ জুটে যায় একটা। খালি পেটে উচ্ছবের উপর আধ মণ করে ওজনের পাঁচ রকমের কাঠ দেড় হাত মাপ করে কাটার দায়িত্ব বর্তায়। উচ্ছব খিদের চোটে বাসিনীর কাছে সামান্য চাল প্রার্থনা করে, শুধু জল দিয়ে চাল খেয়ে নেবে। বাসিনীর চালের বর্ণনা শুনে উচ্ছবের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে ওঠে—

> "ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়বাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজ আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন চাকর ঝি-দের জন্য মোটা সাপ্‌টা চাল। বাদার লোকটি কাঠ কাটতে কাটতে চোখ তুলে দেখে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার।"[২]

উচ্ছব কর্মঠ মানুষ, নিজের কাজের প্রতি একনিষ্ঠ। কাঠ কাটার কাজ শেষ করে, সে ভেবেছিল ভাত পাবে। কিন্তু তান্ত্রিক বিধান দেন হোম-যজ্ঞ শেষ হলে খাওয়া-দাওয়া হবে। ঘটনাচক্রে বাড়ির কর্তা পূজা শেষ হওয়ার পূর্বেই স্বর্গ লাভ করেন। যার ফলে রান্না করা নানা রকমের খাদ্য অশুচি হয়ে পড়ে। মৃত কর্তার শ্মশান যাত্রার পর অশুচি খাদ্য সামগ্রী বাইরে ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব বাসিনীর উপর পড়লে কাজের সাহায্যের জন্য উচ্ছবের ডাক পড়ে। অভাবগ্রস্ত ও উপবাসী উচ্ছব, যার কাছে ভাত হল লক্ষ্মী। ভাত বাড়ির বাইরে ফেলতে গিয়ে উচ্ছব স্থির করে—

> "মোটা চালের ভাতের বড়ো ডেকচি নিয়ে সে বলে, দূরে ফেলে দে আসি।
> --হ্যাঁ হ্যাঁ লয়তো কুকুরে ছেটাবে, সকালে কাকে ঠোক দেবে— বামুন বলে।
> বেরিয়ে এসে উচ্ছব হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। খানিক হেঁটে সে আধা দৌড় মারে।
> ভাত, বাদার ভাত তার হাতে এখন। পথে ঢেলে দেবে? কাক—কুকুরে খাবে?
> --দাদা। --ত্রস্ত বাসিনী প্রায় ছুটে আসে, অশুচ বাড়ি ভাত দাদা খেতে নি দাদা।...
> উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখে এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র। দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে। বাসিনী থমকে দাঁড়ায়।
> উচ্ছব দৌড়তে থাকে। প্রায় এক নিশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায়। বসে ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চুন্নীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারে নি। খেতে খেতে তার যে কি হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন। ... আরো ভাত খেয়ে নি। চুন্নরী রে! তুইও খা, চুন্নরীর মা খাও, ছোটো খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা! আঃ! এবার জল খাই, জল! তারপর আরো ভাত।"[৩]

'সাঁঝ-সকালের মা': মহাশ্বেতা দেবীর অন্যতম একটি ছোটগল্প হল— 'সাঁঝ-সকালের মা'। উক্ত গল্পের মূল চরিত্র জটেশ্বরী ও তার ছেলে সাধন কান্দোরী। সাধনের বাল্যকালেই পিতার মৃত্যু ঘটে। তার মা বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ করেছে তাকে। ঘটনাসূত্রে তার মা নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তার খাতিরে জটেশ্বরী থেকে জটি ঠাকুরনী হয়েছে। কিন্তু ঠাকুরনী হলেও অতিরিক্ত লোভ বা লালসা তার ছিল না। ভক্তের কাছে শুধু সামান্য চালের দানেই তাদের জীবন চলে যায়। জটির হৃষ্টপুষ্ট সন্তান সাধন তার কাছে তিরিশ বছর

বয়সেও 'দুধের ছিলা'। সাধনের বউ পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়িতে রয়েছে। জটি তার সন্তানের সাঁঝ ও সকালের মা। এবং দিনের বেলা জটি ঠাকুরনী অগণ্য ভক্তের আশ্রয়স্থল। ঠাকুরনীর পোশাক বলতে লাল রঙের চেলি, দিনে তার খাদ্য বস্তু— গঙ্গা জল, চা ও গাঁজা। জটি সারাদিনে ভক্তদের কাছ থেকে যে চাল পেয়ে থাকে, সেটাই সাধনকে রাত্রে ভাত রান্না করে দেয়। তার নিজের পেটে তেমন কিছু পড়ে না। গল্পে দেখা যায়, সাধন মায়ের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। সাধনের প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে লিখেছেন—

> "মা ছাড়া সাধন কান্দোরী কিছু জানে না। সাধন নির্বোধ, তিরিশ বছর বয়সেও ওর বুদ্ধিসুদ্ধি অপরিণত। মোষের মত শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ... আর আছে খিদে। শুধু খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে ওর মনিবের যুবতী বউ কাঠ চ্যালা করায়, টিউবকলের জল টানায়। মণ মণ কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।"[৪]

উক্ত গল্পের প্রারম্ভেই দেখা যায় সাধনের মা অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিন দিন পর ডাক্তার জটির রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সাধনের মা 'অনাহার' রোগে আক্রান্ত। যে রোগের চিকিৎসা, চিকিৎসকের কাছে নেই। জটির ইচ্ছানুসারে নিজের বাড়ির উঠোনেই তার জীবনের অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত হয়। সাধনের প্রথম এবং একমাত্র ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল জটি স্বর্গলাভ করে। জটির শিষ্য অনাদি ডাক্তারের অর্থানুকূল্যে সাধনের মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সাধন আজ বড় একা, তাকে ভাত দেওয়ার কেউ নেই। মায়ের শ্রাদ্ধের চাল সাধন পুরোহিতকে দান করতে অনিচ্ছুক। কারণ তার হাতে টাকা নেই, বাড়িতে চালও নেই। 'ভাত' প্রিয় সাধন বাড়িতে গিয়ে কী খাবে? তাই সে চাল নিয়ে শ্রাদ্ধের শেষে পুরোহিতের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে—

> "মত্ত হাতীর মতো চেঁচিয়ে উঠল সাধন। বলল, ঘরে কানাকড়ি লাই যে কিনে আঁধব। ই চাল আমি হাত ছাড়া করি!...পুরুত নিষ্ফল আক্রোশে বলল, 'শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে রেঁধে খাওয়া? এই শ্রাদ্ধ তোর নষ্ট হল ব্যাটা!"[৫]

মানুষ অভাবের কাছে অসহায়। তা সাধনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। গল্পের শেষাংশে সাধনের একাকী জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার জানিয়েছেন, যে—

> "বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে ভাত রাঁধবে। ভাতের গন্ধ বড় ভালো গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, তত দিন ওর কাছে সাঁঝ-সকালের মা বাঁধা থাকবে।"[৬]

পেটের ক্ষুধা বড় বালাই, সামান্য চাল, তাও আবার শ্রাদ্ধের চাল, যেটি শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সেটিও সাধন হাত ছাড়া করতে চায় না। অভাব, অনাহার, অনটন মানুষকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে সাধন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তার কৃত কর্মের জন্য সে অনুশোচনা করেছে ঠিকই কিন্তু বর্তমান অবস্থা তাকে নিরুপায় করে তুলেছে। তাই মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে দুঃখের স্বরে সাধনের উক্তি—

> "মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।"[৭]

'জাতুধান': 'জাতুধান' গল্পের নায়ক সাজুয়া তিওর। 'ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত 'সেমি শহর' বেলেটি। আর এই বেলেটির তিওর পাড়াতেই সাজুয়ার বাসস্থান। এই অঞ্চলের জমিদার রাম সিংগি এবং তার প্রজা হল তিওর সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তিওরা বর্গাদার। সাজুয়াকে গল্পকার রাম সিংগির মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিনে গল্পের অন্যান্য চরিত্র এবং পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—

> "সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, 'এর কথাই বলছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।' সাজুয়া না বলে খেয়ে যাচ্ছিল। ওদের বেলা ভাত-ডাল-কুমড়োর ঘ্যাঁট ও মাছের টক। ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল ও কথা না কয়ে। ওর রাক্ষুসে খাওয়া লোকে দেখে ও জানে। ও তাতে বিচলিত হয় না।"[৮]

সাজুয়ার খাওয়া শেষ হওয়ার পর শ্রাদ্ধের পুরোহিত মশায় ও সাজুয়ার কথোপকথন থেকে তার নামকরণের ইতিহাস জানা যায়। এবং এই নামটি সে সানন্দে গ্রহণ করেছে। সেই সাথে তার সংসারের অভাবের চিত্রও পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না—

> "দেখতে দেখতে পুরুত বললেন, 'এটা বেটা জাতুধান। মানে রাক্ষস।' সাজুয়া খেয়ে সে বামুনকে প্রণাম ঠুকল। বলল, 'কি বলছিলে হে ঠাকুর? খাওয়া দেখছিলে? খাওয়ার লেগে রাক্ষস বলে মোরে সবাই। উ পরিবারও বলে। লামে কি হয়? ...পুরুত বললেন 'রাক্ষস কি হে। তুমি বাবা জাতুধান! "রাক্ষস" নামে জাঁকজমক নাই। জাতুধান বলে বেশ মানাচ্ছে।' 'তা ভাল'। 'তা বাবা, পেটটি করেছ বড়। পেটের অন্ন জুটাতে তো মুশকিল।' জুটে কই? জুটে না ত? যেদিন জুটবে, খুব খাব। না জুটলে পেটে কিল।' সেই থেকে সাজুয়া জাতুধান। আর সবাই ভোজ পেয়েছে, ও একটা সম্মানী খেতাবও পেয়েছে। জাতুধান! নামটি ওর পছন্দ হয়েছে উচ্চারণ করতে ওর জিভেও এড়ে না।"[৯]

ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত বেলেটির চরে কৃষিকাজের উপর সাজুয়া নির্ভরশীল। কোনো বছর চাষ হয়, আবার কোনো বছর নদীর জলে ফসল ভেসে যায়। যখন চাষের কাজ হয়, তখনই সাজুয়ার ঠিক মতো পেট ভরে না। এবং গল্পে দেখা যায়, সাজুয়ার বউ তাকে কম খাওয়ার পরামর্শ দিলে, সে তা রাখতে পারে না। তখন সে তিওরদের নেতা মাতং-এর নেতৃত্বে বেলেটির বাইরে কখনও ঠিকামজুরের কাজে, কখনও চাষের কাজে চলে যায়। সে পেটচুক্তি ভাতে কাজ করে, মজুরী নেয় ধানে। একবার কাটোয়াতে চাষের কাজের সময় কুণ্ডু বাড়িতে তার কাকা মারা গেলে অশুচি ভাত দুদিন ধরে সাজুয়া খেয়ে ছিল। আবার কখনও রাম সিংগির বাড়িতে কাজ করে দুবেলা পেটচুক্তি ভাতে।

গল্পে দেখা যায়, ফারাক্কা জলাধারে জল ছাড়ার খবর রাম সিংগির কাছে এলে সে তার গরু মহিষের বাথান উচ্চস্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। এবং সাজুয়া তার গৃহপালিত পশুদের জন্য গোয়াল ঘর বাঁধে পেটচুক্তি ভাতে। কিন্তু রাম সিংগি জল ছাড়ার সংবাদটি গ্রামবাসীদের কাছে গোপন রাখে। দুদিন পর গ্রামে বন্যার জল এসে পড়ে। অপর দিকে রাম সিংগি, সাজুয়া ও তিওরদের চাষের ফসল রয়েছে বেলেটির চরে। মাতং তখন রাম সিংগির কথা মতো সাজুয়া ও অন্যান্য কৃষকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চরে সোনার ফসল বাঁচাতে। আর সাজুয়া ফসল বাঁচাতে গিয়ে বন্যার জলে তলিয়ে যায়। গ্রামের মানুষ ও সাজুয়ার পরিবারভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। কারণ জলের মধ্যে পুলিশ তার চেহারার সাদৃশ্য একটি পচাগলা লাশ উদ্ধার করে।

মাতং নিজেও তিওর সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাদের নেতা। সে এই কঠিন অবস্থায় সাজুয়ার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। সাজুয়ার কুশ পুতুল দাহ করা হয়। তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য রাম সিংগির কাছ থেকে মাতং চাপ দিয়ে এক বস্তা চাল আদায় করে নিয়ে আসে। এবং বাকি সব ব্যবস্থা করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ঘটনাসূত্রে সেদিন রাত্রে মাতং-এর বাড়িতে হঠাৎ করে সাজুয়া এসে উপস্থিত হলে সে অবাক হয়ে যায়। তারপর সাজুয়া নিজের বাড়িতে এলে তার মা ও বউ তাকে দেখে ভাবে ভূত এসেছে। সাজুয়া তার পরিবার ও মাতংকে জানায় বন্যার জলে কীভাবে সে বেঁচে ফিরে এসেছে, তার কাহিনি। মাতং ও সাজুয়ার পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় যে, শুদ্ধ করে সাজুয়াকে ঘরে তুলবে। এবং চাল রাম সিংগিকে ফিরিয়ে দেবে। সাজুয়া বাড়িতে বস্তা ভর্তি নিজের শ্রাদ্ধের জন্য আনা চাল দেখে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। সে ভাবে মাতং ব্যতীত বাইরের কোনো ব্যক্তি তার জীবিত থাকার সংবাদ জানে না। তাই মাতংকে অনুরোধ করে সংবাদটি চেপে যেতে। তারপর সাজুয়া বস্তা ভর্তি চাল ও তার পরিবারকে নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে ঘর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়—

> "সাজুয়া হাসে। বলে, 'আমি তো রাক্ষস, জাতুধান, আমার ছরাদের চাল আমি খাব না? আরে এমন ছরাদ হয় নাই! যার ছরাদ সে এসে ভাত খায়, কেউ এমন ছরাদ দেখেছে?'... 'শুদ্ধি হল না, দাহ হল, দেও-দেবতার রিষে পড়বি।' 'পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার বের্খা যায়।"[১০]

২

মহাশ্বেতা দেবী বিংশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জনজাতিদের নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-জীবিকার সাথে পরিচিত হয়েছেন। এবং সাহিত্যে তাদের কথা তুলে ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'মহাশ্বেতা দেবীর গল্পসঙ্কলন'-এর ভূমিকাংশ থেকে জানা যায়—

> "1984 সালে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন, 'সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।' এই 'অবিচ্ছিন্ন ধারা'টিও বায়বীয় কিছু নয়, বরং জাতপাত, জমিজঙ্গলের অধিকার, এবং সর্বোপরি ক্ষমতাসীন শ্রেণীর ক্ষমতার আস্ফালনের তথা কায়েম রাখার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণের ক্রমান্বয়িক ইতিহাস।"[১১]

'ভাত' গল্পে উৎসব নাইয়া, 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে সাধন কান্দোরী ও 'জাতুধান' গল্পে সাজুয়া তিওর এই তিনটি চরিত্র তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ। চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে খাদ্য সুরক্ষার অভাব গল্পকার যেভাবে তুলে ধরেছেন তা তৎকালীন সময়ের ইতিহাসকেই ব্যক্ত করে। ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্যগুলির মধ্যে অন্যতম 'ভাত'। কিন্তু উক্ত গল্পগুলিতে ভাতের অভাবের তাড়না চরিত্রগুলির মন-প্রাণ বিচলিত করে তুলেছে। যার ফলে শ্রাদ্ধের

চাউল হোক, বা দানের চাউল, বা অশুচির ভাত খাদ্যের তাড়না যেখানে দেখা দেয়, সেখানে শাস্ত্র, নিয়ম-নীতির কোন বাঁধন মানে না। কথায় আছে খালি পেটে ধর্ম হয় না।

'ভাত' গল্পে সতীশের অধীনে কৃষিকাজ করা কৃষক উচ্ছবের ভাতের অভাব দেখা যায়। কিন্তু সতীশের বা কলকাতার বাবুদের 'বাদা' থেকে আসা চালের অভাব হয় না। সমাজের কৃষক শ্রেণির এই দুর্দশার চিত্র শুধু 'ভাত' গল্পেই নয়, 'জাতুধান' গল্পের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। 'জাতুধান' গল্পে শুধু নামের বদল হয়েছে, 'সতীশ'- এর স্থানে রাম সিংগি দ্বারা সাজুয়ার একই শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। উচ্ছব এবং সাজুয়া দুজনেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে। উচ্ছব তার সমগ্র পরিবারকে হারিয়েছে আর সাজুয়া একা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মৃত্যুকে জয় করে ফিরে এসেছে। অভাবের তাড়নায় উচ্ছব হোক, সাজুয়া হোক বা সাধন তিনটি চরিত্রই শ্রাদ্ধের অশুচি ভাত ও চাল খেতে দ্বিধাবোধ করেনি। উচ্ছব খেয়েছে কলকাতার বাড়ির কর্তার মৃত্যুর পর অশুচি ভাত আর সাজুয়া কাটোয়াতে কৃষিকর্ম করতে গিয়ে অশুচি ভাত দুদিন ধরে খেয়েও ক্ষান্ত হয়নি। তার নিজের শ্রাদ্ধের জন্য আনা চাল সে নিজে খাবে এই নিয়ে গর্ব করেছে। সাধন মায়ের শ্রাদ্ধের চাল একরকম জোরপূর্বক পুরোহিতের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে রান্না করে ভাত খেয়েছে। বাসিনী উচ্ছবকে, মাতং সাজুয়াকে, আর পুরোহিত সাধনকে অশুচি ভাত, দেবতার রোষ আর মায়ের শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ার কথা বললেও অভাবের তাড়না চরিত্রগুলিকে একরকম বাধ্য করেছে। আবার 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে যুবতী জটেশ্বরী একদিন সমাজের দুষ্কৃতিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ও পেটের তাগিদে নিজের রক্ষাকবচ হিসেবে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। তেমনি তার অন্যতম একজন শিষ্য অনাদি ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায় অন্যায় কাজ করে জটি ঠাকুরনীর আশ্রয়ে এসে পাপমুক্ত হয়ে অন্নদান করেছে। কিন্তু সমাজে শোষিত, অবহেলিত ও বঞ্চনার শিকার উচ্ছব, সাজুয়া আর সাধন শাস্ত্র বা ধর্মের বাঁধন মানে না। সামান্য 'ভাত'-এর জন্য এই মানুষগুলিকে দিয়ে সহজে বহুকাজ করিয়ে নিয়েছে গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলি। যেমন— উচ্ছবকে সতীশ ও কলকাতার কাজের বাড়ির পিসিমা, সাজুয়াকে দিয়ে রাম সিংগি আর আর সাধনকে দিয়ে তার মনীবের যুবতী স্ত্রী। কর্মের বিনিময়ে একবেলা পেটচুক্তি ভাত। এই ছিল তৎকালীন সময়ের ব্যবস্থা। সমাজের সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার প্রতিচ্ছবি। উচ্ছবকে ভাত চুরির অপরাধে নয়, পিতলের 'ডেকচি' চুরির অপরাধে পুলিশ ধরেছে। সাধন মায়ের মৃত্যুর পর অসহায়। ভাতের কথার মধ্যে দিয়ে মাকে মনে পড়বে তার। আর সাজুয়া অভাবের তাড়নায় গৃহত্যাগ করেছে। এবং এক বস্তা চালের জন্য রাম সিংগিকে ফাঁকি দিয়ে সে নিজেকে ভাগীরথী নদীর থেকে শক্তিমান মনে করেছে।

মহাশ্বেতা দেবী উক্ত তিনটি গল্পে একটি সাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা হল ভাতের অভাব। একমাত্র 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে সাধনের মা জটি নিজে অনাহারে থেকে তার নির্বোধ ছেলের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করে। এখানে জটির শুধুমাত্র সকাল ও সন্ধ্যের মা হওয়ার পিছনে যে রহস্য রয়েছে তা হল সন্তানের খাদ্যের আপূর্তি। আবার অন্য দুটি গল্পের মুখ্য চরিত্র উচ্ছব ও সাজুয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। ভাতের কারণেই অন্যায় করার অপরাধে শেষ অবধি উচ্ছবকে পুলিশ ধরেছে। এবং সাজুয়ার অতিরিক্ত আহারের জন্য তার নামের পরিবর্তন হয়ে 'রাক্ষস' থেকে 'জাতুধানে উন্নীত হয়। এই দুটি চরিত্র ভাতের অভাবের জন্য নিজ নিজ বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে ।

তাই বলাবাহুল্য মহাশ্বেতা দেবী যে সময়ে গল্পগুলি রচনা করেছেন, সেই সময়ে সমাজের সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম 'ভাত' বা খাদ্যের অভাব। তিনি সুকৌশলে তাঁর গল্পে সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন সমস্যাকে সাহিত্যের পাতায় চিত্রিত করেছেন। এর মধ্যে লেখিকার শৈল্পিকগুণের প্রকাশ ঘটেছে। এবং একজন সমাজ সচেতন গল্পকাররূপে সাহিত্যের ইতিহাসে সার্থকতা লাভ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. Bardhan Kalpana, (Edited) '*Of Women, Outcastes, Peasants, and Rebels: A Selection of Bengali Short Stories*'. University of California Press, California, 1990. P. 24
২. দেবী মহাশ্বেতা, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২১০।
৩. তদেব, পৃ. ২১৬।
৪. দেবী মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, পৃ. ৬১।
৫. তদেব, পৃ. ৮০।
৬. তদেব, পৃ. ৮০।
৭. তদেব, পৃ. ৮০।
৮. দেবী মহাশ্বেতা, 'বেহুলা', অন্যধারা, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬।
৯. তদেব, পৃ. ৫৭।
১০.তদেব, পৃ. ৭৫।
১১. দেবী মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ভূমিকাংশ, পৃ.৭।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মহাশ্বেতা দেবী, 'বেহুলা', অন্যধারা, কলিকাতা, ১৩৬৮।
২. মহাশ্বেতা দেবী, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া।
৩. মহাশ্বেতা দেবী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪।